প্রবন্ধ ১

শুধু আমাদের জন্য

জহর সরকার

৩০ অক্টোবর, ২০১৬, ০০:০০:০০

এবং রফতানি। মরিশাসে কালীমূর্তি।

বাঙালির ধাতটাই যে আলাদা, সেটা কেবল তাকে কাঁটাওয়ালা মাছ মুখে নিয়ে অনর্গল তর্ক করতে দেখেই বোঝা যায় না, বাঙালির সরকার এবং ভগবান যে অবশিষ্ট ভারতের চেয়ে এতটাই অন্য রকম, সেটাও তার একটা প্রমাণ। ঠিক তেমনই, দেওয়ালির সময় অন্যরা যখন সহস্র আলো জ্বালিয়ে গৌরবর্ণা দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে শ্রী-সম্পদ চায়, তখন বাঙালি অমাবস্যার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দেবীর পুজো করে শক্তি চায়। শক্তি অবশ্য তার খুবই দরকার। দেওয়ালিতে অন্য ভারতীয়রা সম্পূর্ণ নিরামিষ খায়, আর মাংস এবং রক্তবর্ণ জবাফুল ছাড়া বাঙালির কালীপুজো হয় না। এবং, অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে দেওয়ালির পিছনে আছে কৃষ্ণের নরকাসুর বধের কাহিনি, বাঙালির কালীপুজো এসেছে স্কন্দপুরাণে দেবী চণ্ডীর রক্তবীজ নিধনের সূত্র ধরে। রক্তবীজের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে অসুরের জন্ম হয়ে চলেছিল, শেষে চণ্ডী ভয়ংকরী কালীমূর্তি ধরে সমস্ত রক্ত পান করে নিলে দানবকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

গোপালকৃষ্ণ গোখলের উক্তি হিসেবে পরিচিত কথাটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য বাঙালি সব কিছুই যেন একটু অন্য ধারায় করে। যেমন, সে পিতৃপক্ষ পালন করে মহালয়ার দিন, অথচ ভারতের অন্যান্য জায়গায় পিতৃপক্ষ পালিত হয় দেওয়ালির সময়। বাঙালি দেওয়ালির সময় ধুমধাম করে লক্ষ্মীর আরাধনা না করে দুর্গাপুজোর সাত দিন পর খুব শান্ত ভাবে লক্ষ্মীপুজো করে। এমনকী বাঙালি কারিগররা তাঁদের যন্ত্রপাতির পুজো সেরে ফেলেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, অথচ বাকি ভারত হয় দুর্গাপুজোর দশমী কিংবা দেওয়ালির সময় যন্ত্রের পুজো করে। বাঙালির কালীপুজো একটা রাতের ব্যাপার, কিন্তু ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে দেওয়ালির উৎসব হয় চার-পাঁচ দিন ধরে— শুরু হয় ধনতেরাস দিয়ে, তার পর চলে ছোটি দিওয়ালি, বড়ি দিওয়ালি, গোবর্ধন পুজো আর শেষ হয় ভাই দুজ বা ভাইফোঁটায়।

ঠিক কবে থেকে দেওয়ালি 'আলোর উৎসব' হয়ে উঠল, সেটা স্পষ্ট নয়। আদি রামায়ণে রামের চোদ্দো বছর বনবাস এবং রাবণবধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের দিনটিকে দেওয়ালি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এই কাহিনিটি এসেছে রামায়ণের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে। তৃতীয় শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন রচিত 'কামসূত্র'তে প্রদীপ দিয়ে সব বাড়ি সাজানোর উল্লেখ পাওয়া

যায়, কিন্তু তখন এর নাম ছিল সেই দিনটিকে যক্ষ-নিশা বলা হত। অন্যান্য অনেক আচার-আচরণের মতোই, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম এই আলোকময় অনুষঙ্গটিকে গ্রহণ করে লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে জুড়েয়েছে। কিন্তু বাংলায় আমরা মা কালীর জন্য ঘোর অমাবস্যার রাত্রিকেই বেছে নিয়েছিলাম। পরে যখন একে অপরের প্রথা ও আচার অনুকরণ করাটা সর্বভারতীয় নিয়ম হয়ে উঠল, তখন কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত হল প্রদীপ, আলো, বাজি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফসল কাটার সময় লক্ষ্মীপুজো করার একটা যুক্তি রয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘লক্ষ্মীর অপর একটি নাম শ্রী। শ্রী নামটি এসেছে ল্যাটিন ‘সেরেস’ থেকে, যার অর্থ হল শস্যের অধিষ্ঠাত্রী’। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘শ্রী’র সমতুল্য ইন্দো-চিন ও ইন্দোনেশিয়ার দেবী ‘দেবী সিরি’র কথা লিখেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় এই শস্যের দেবীর উপাসনা করা হয়— দেবীমূর্তির হাতে এক গুচ্ছ শস্যের শীষ অথবা গ্রিক ‘কর্ন্যুকোপিয়া’ বা শস্যপাত্র।

দেওয়ালি আবার আর্থিক লেনদেনের একটা শুভলগ্নও বটে। এই উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ, রাজা, জমিদারকে শস্য ও বিভিন্ন উপহার দেওয়ার রীতি আছে। ধর্মীয় আচারে এই রীতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, এই কারণে, যাতে ব্যবসায়ী, কৃষক এবং সাধারণ গৃহস্থরা ঈশ্বর ও শাসককে তাঁদের প্রাপ্য দিতে না ভোলেন। ব্যবসায়ীরা হালখাতা শুরু করেন এই পুণ্য সময়ে। দেওয়ালি এবং ধনতেরাসে গয়না আর বাসনপত্র কিনতে হবে, এটাই হল নিয়ম। আসলে ব্যবসায়ী ও কারিগররা যাতে নতুন ফসল থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটা অংশ পান, সেই জন্যই এই উপহার ও কেনাকাটার রীতি। এমনকী এই সময় জুয়া খেলারও অনুমতি মেলে। উত্তর-ভারতে অনেকেই এই সময়টায় কয়েক দিন এবং রাত ধরে প্রচুর জুয়া খেলেন। মা লক্ষ্মী মাঝেমধ্যেই বাঙালির প্রতি বিমুখ হলেও বাঙালিরা তাঁকে অবজ্ঞা করে না। কিন্তু এই সময়টা তারা কালীঠাকুরের জন্য বরাদ্দ রাখে, অন্য দেবদেবীরা একটু আড়ালে চলে যান। বাঙালি আসলে সব সময়ই অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। তার হালখাতা পয়লা বৈশাখে, লোকজনকে উপহার দেওয়া হয় দুর্গাপুজোয়।

এই ‘ভয়ঙ্করী মাতা’র আরাধনার ধারাটি র‍্যাচেল ম্যাকডারমট, ওয়েন্ডি ডনিগার, বারবারা ওয়াকার এবং আরও বহু বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও গবেষককে আকর্ষণ করেছে, শাক্ত মতের অনুসারী বহু ভারতীয় পণ্ডিতও এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছেন। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়, শস্যের দেবীর মতোই, মাতৃদেবীর পুজোর একটি প্রবল ধারার প্রমাণ রয়েছে, যেখানে দেবী মাতা শক্তি, সুরক্ষা, রক্ত ও বিজয়— সব কিছুরই প্রতীক। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জোসেফ ভার্মাসেরেন বলেছেন, এশিয়া মাইনরে কালীর সমতুল্য দেবী কাইবেলে-র নিজস্ব একটি শহর ছিল ‘কালি-পোলিস’। এটিই পরে হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত শহর গ্যালিপোলি। এমনকী বাইবেল-এর ‘বুক অব হিব্রু’(৯:২২)-তে এই কালির পুজোয় রক্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইউরোপের জিপসিরা বহু শতাব্দী ধরে এই মাতৃশক্তিকে মৃত্যুর দেবী হিসেবে পুজো করে এসেছে, যেমন আমরা শ্মশানকালীর পুজো করি। প্রাচীন ফিনল্যান্ডেও কালমা নামে এক কৃষ্ণাঙ্গী দেবী ছিলেন, তিনি সমাধিস্থলে ঘুরে বেড়াতেন এবং মৃতদেহ ভক্ষণ করতেন। রোমানরাও ধরিত্রীমাতার আরাধনা করত, এবং তাঁর রংও কালো। ভারতের কথায় আসা যাক। মহাভারতে এক কৃষ্ণবর্ণা দেবীর কথা আছে, শবর, পুলিন্দা এবং ‘বর্বর’রা তাঁর পূজা করত, সেই পূজায় রক্ত অর্পণের প্রথা ছিল। এই ঐতিহ্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে ক্রমশ অন্য নানা ধরনের পুরাণ বা উপপুরাণ এবং তন্ত্রকথার মাধ্যমে মূলধারার হিন্দুধর্মে প্রসারিত হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘রক্তপিপাসু দেবীর সঙ্গে রোমান যুদ্ধের দেবী বেলোনা-র মিল আছে যাঁর পূজারিরা নিজেদের হাত-পা কেটেও রক্ত দিতেন।’ তাঁর মতে, ‘কালীর উৎসে হয়তো আছেন আদিম দেবী।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুটি ধারা পরস্পরের সমান্তরাল ভাবে চলে আসছে: এক দিকে শ্রী-সম্পদের মঙ্গলময়ী দেবী, অন্য দিকে রক্ত এবং ধ্বংসের প্রতিমূর্তি ভয়ানক ঈশ্বরী। স্পষ্টতই, অধিকাংশ ভারতীয় প্রথম ধারাটি বেছে নিয়েছিল, আর বাঙালিরা অনুসরণ করেছিল দ্বিতীয় পথ, কিন্তু বহু শতাব্দী পাশাপাশি চলতে চলতে এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রভাবে, দুটি ধারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গিয়েছে। কালীপুজো এবং দেওয়ালির সমন্বয় এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।